সবার প্রিয় মার্ক টোয়েন

বিজয় মজুমদার

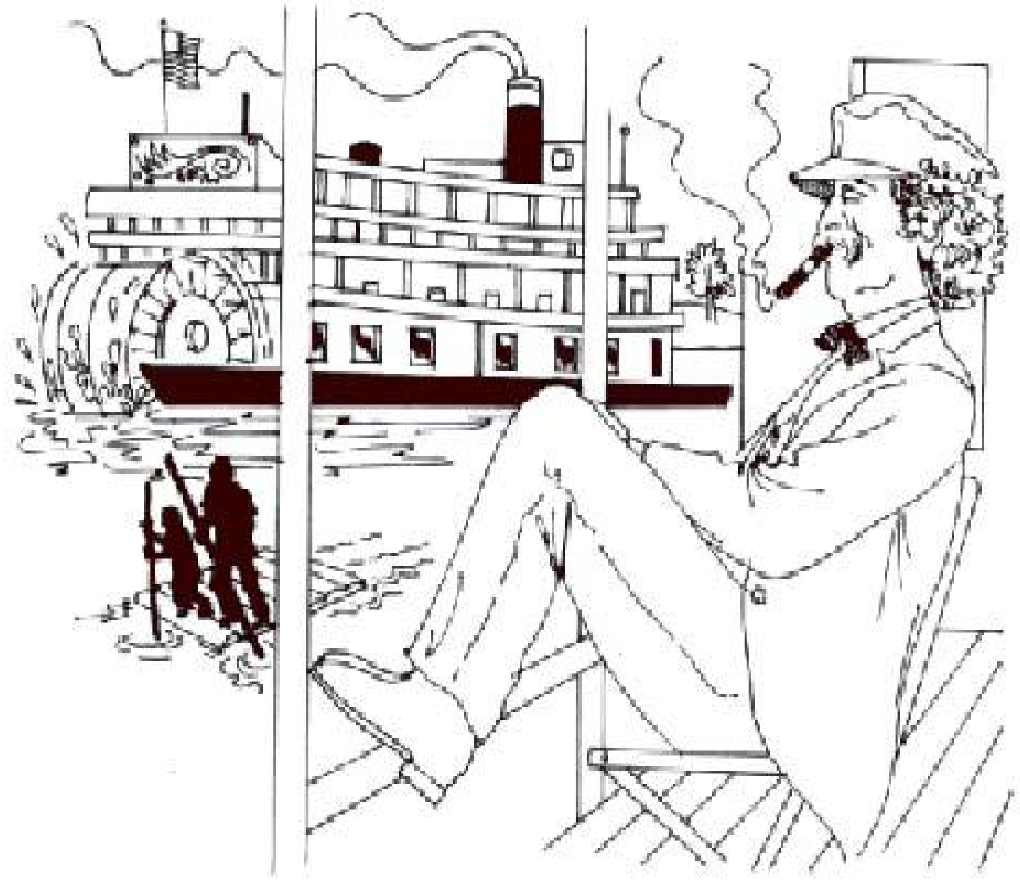

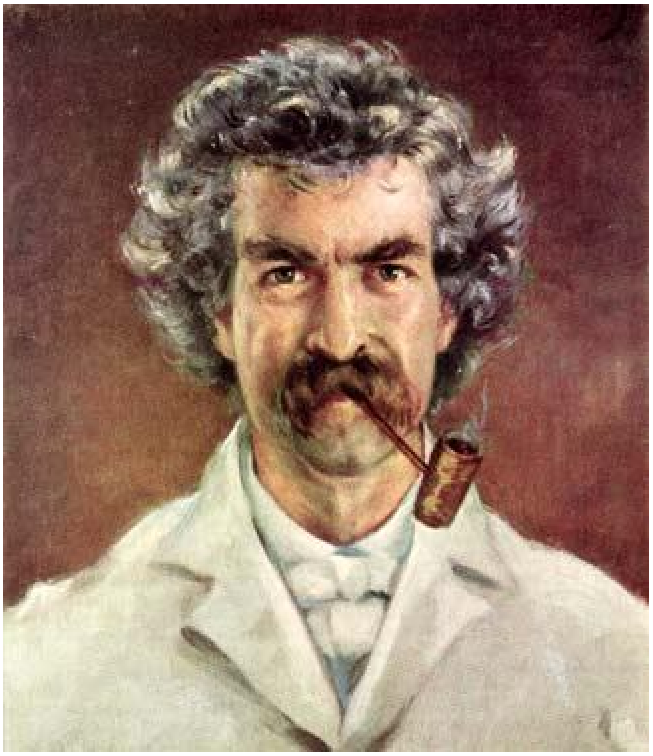

আমাদের দেশে অনেক স্থানে খালাসিরা নদীর গভীরতা মাপার জন্য নদীতে মাপের দড়ি নামিয়ে সুর করে বলতো, এক বাঁও মেলেনা, দু বাও মেলে। নদী পথে মার্কিন খালাসিরাও নদীর গভীরতা মাপার সময় এভাবে ‘মার্ক টোয়েন’ শব্দটা ব্যবহার করতো। এটা নাহয় মানা গেল। কিন' কোন মানুষের যদি এ রকম একটা নাম হয় তাহলে? নিশ্চয়ই সবাই খুব অবাক হবে। হ্যাঁ, এ রকমই একটা নাম লেখার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এক লেখক। তার নাম মার্ক টোয়েন। মার্ক টোয়েন মানে- এখানে পানির গভীরতা দুই ফ্যাদম বা ১২ ফুট।

আসলে ‘মার্ক টোয়েন’ কথাগুলো এসেছে মিসিসিপি নদীর নৌকার মাঝিদের বলা শব্দ থেকে। সেখানে বলা হতো, ‘হাফ টোয়েন! কোয়টার টোয়েন! মার্ক টোয়েন।’ মার্ক টোয়েন শব্দের মূল মানে হচ্ছে মার্ক নাম্বার টু বা মার্ক দ্বিতীয়। এই কথার মাধ্যমে বোঝা যেত যে, নদীর এই অংশ স্টিমবোটের জন্য নিরাপদ।

মিসিসিপি নদীর ধারে চলা স্টিমারে এক সময় কাজ করেছিলেন মার্ক টোয়েন ওরফে স্যামুয়েল ল্যাঙ্গহর্ন ক্লিমেন্স। যখন তিনি লেখা শুরু করেন তখন আসল নাম বাদ দিয়ে দেন। তার নাম হয়ে যায় মার্ক টোয়েন। এরপর থেকে সবাই তাকে এই নামে ডাকতে শুরু করে। আর তারপর এই নামই হয়ে যায় তার পরিচিত নাম।

সারা জীবন তিনি হাসির গল্প লিখেছেন। তার অনেক লেখাই ছিল ছোটদের জন্য। কিন্তু বড়রাও সেসব লেখা পড়ে মজা পেত এবং এখনও পায়। তার সেরা লেখার মধ্যে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চার অফ টম সয়্যার, অ্যাডভেঞ্চার অফ হাকলবেরি ফিন, দি প্রিন্স অ্যান্ড দি পপার এ রকম আরো অনেক লেখা।

মার্ক টোয়েনের জন্ম আমেরিকার ফ্লোরিডা রাজ্যের মিসৌরিতে। সেখানকার মো নামের এক ছোট্ট শহরে ১৮৩৫ সালের ৩০ নভেম্বর তার জন্ম হয়। বাবার নাম জন মার্শাল ক্লিমেন্স আর মা জেন ল্যাম্পটন ক্লিমেন্স। তিনি ছিলেন তার বাবা মার ষষ্ঠ সন্তান। মোট

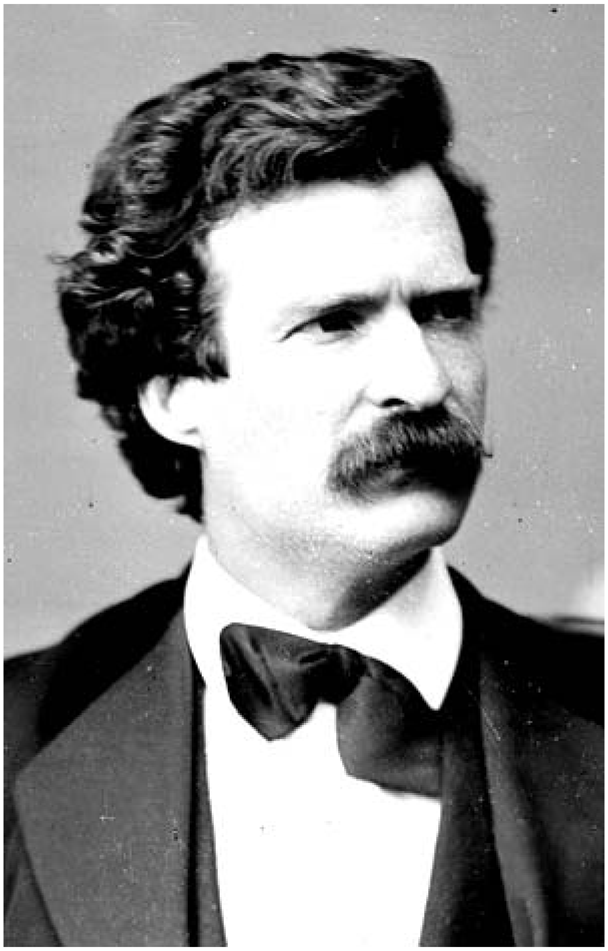

সাতটি ভাইবোন ছিল তার, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র তিনজন বেঁচে ছিলেন। বাকীরা শৈশবেই মারা যান।

টোয়েনের বয়স যখন চার তখন তার পরিবার হানিবল নামের এক জায়গায় চলে যায়। এলাকাটি ছিল মিসিসিপি নদীর ধারে। টোয়েনের বয়স যখন ১১ বছর সে সময় হঠাৎ তার বাবা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। যার ফলে তাকে জীবকা নির্বাহের তাগিদে কাজে নেমে পড়তে হয় তাকে। তিনি প্রথমে টাইপ সেটিং এর কাজ নেন। আগের দিনে পত্রিকায় অক্ষর বসিয়ে লেখা ছাপানো হত। এর জন্য আলাদা আলাদা টাইপ তৈরি করতে হতো। হানিবল জার্নাল নামের পত্রিকায় এই কাজ দিয়ে মার্ক টোয়েন তার কর্ম জীবন শুরু করেন। পত্রিকাটি ছিলো তার বড় ভাই অরিয়নের। সেই পত্রিকাতে তিনি প্রথম লিখতে শুরু করেন। এগুলো সবই ছিল হাসির।

পাশাপাশি অবসরে তিনি স্থানীয় পাবলিক যাতায়াত শুরু করেন। দেশ বিদেশের বইয়ের সংস্পর্শে এসে তার মনের ভেতর আজব এক জগৎ খুলে যেতে শুরু করে। তিনি অনেক বিষয়ে তার কৌতূহল মেটাতে থাকেন এসব বই পড়ে।

এর কিছুদিন পর তিনি আমেরিকার বিভিন্ন শহরে কাজের জন্য ঘুরে বেড়ান। এর মধ্যে ছিল নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, সেন্ট লুইস। এ সব শহরে তিনি প্রিন্টিং এর কাজ করতেন। যখন তার বয়স ২২ তখন তিনি আবার তার পুরনো শহরে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি বিক্সবি নামের এক লোকের সাথে পরিচিত হন। এই বিক্সবি ছিলেন স্টিমবোট বা নদীতে চলা লঞ্চের পাইলট। তার সাথে দেখা হবার পর টোয়েন ঠিক করেন তিনি এই রকম স্টীমবোটের পাইলট হবেন। সে সময় একজন পাইলট মাসে বেতন পেত ২৫০ ডলার।

বোটে কাজ নিয়ে টোয়েন মিসিসিপি নদীর প্রায় ২০০০ মাইল ভ্রমণ করেন। দুই বছর বোট এ থাকার পর তিনি ১৮৫৯ সালে বোট পাইলটের লাইসেন্স পান। জাহাজে থাকার সময় তিনি একদিন এক স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নটি ছিল এ রকম যে, এক জায়গায় গিয়ে টোয়েন দেখছেন সবাই কাঁদছে। কারণ তাদের প্রিয় একজন মানুষ মারা গেছে। টোয়েন মৃত মানুষটির চেহারা দিকে তাকালেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, সেই ব্যাক্তিটি আর কেউ নয় তার আদরের ছোট ভাই হেনরি। তার লাশের উপর একটা লাল গোলাপ রাখা।

এর ঠিক একমাস পর ১৮৫৮ সালের ২১ জুন হেনরি মারা যায়। হেনরি ছিলেন খুবই জনপ্রিয় এক ব্যক্তি। তার মৃত্যুতে গোটা মিসিসিপি নদীর তীরে শোক নেমে আসে। পুরো দৃশ্যটি মার্ক টোয়েনের স্বপ্নের সাথে মিলে যায়। কেবল সেই লাশের উপর কোন গোলাপ ছিল না। এরপর টোয়েন প্যারাসাইকোলজির বা অস্বাভাবিক বিষয় নিয়ে যে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা, তার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি প্যারাসাইকোলজি চর্চা নিয়ে গঠিত সোসাইটির প্রথম দিককার সদস্য হন।

মার্ক টোয়েন নদীর মানুষই হয়ে থাকতেন যদি না সে সময় আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেত। ১৮৬১ সালে আমেরিকার একদল মানুষ বললো, দাসদের স্বাধীন করা যাবে না। তারা আলাদা এক রাষ্ট্র গঠন করতে চাইলো। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তা মানলেন না। দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এর ফলে মিসিসিপি নদীতে জাহাজ চালাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

টোয়েন এবং তার ভাই কনফেডারেশন বা বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। কারণ তাদের রাজ্য মিসৌরি এই দলে যোগ দিয়েছিলে। তবে যুদ্ধের মাঝামাঝিতে তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। এই সময় তিনি বেশ কয়েকটি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। যুদ্ধ এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি অনেক কাহিনী রচনা করেন। তার যাত্রা শেষ হয় ভার্জিনিয়া শহরে। সেখানে তিনি খনি মালিক হন। কিন্তু যিনি নিজেই গল্পের খনি তাকে কি খনিতে মানায়? খনি থেকে কিছু না পেয়ে তিনি সেখানকার টেরিটোরিয়াল এন্টারপ্রাইজ নামের এক পত্রিকায় যোগ দেন।

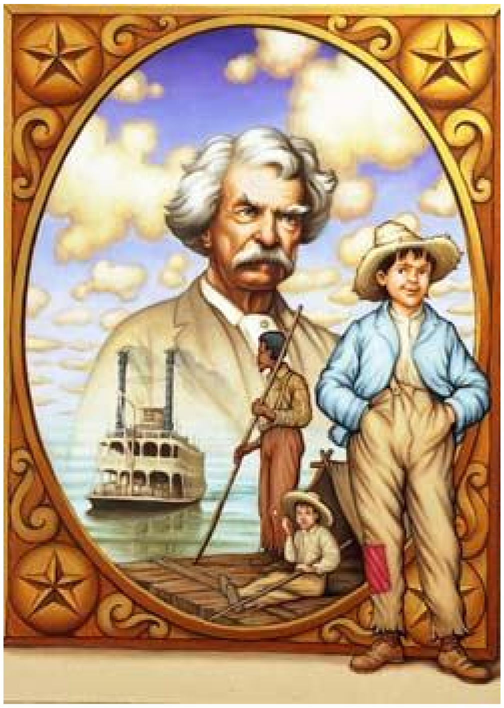

কিন্তু ভ্রমণের নেশায় আবার তিনি বের হয়ে পড়েন। এবার শুধু ভ্রমণ নয় তার সাথে তার কলমও চলতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় তিনি শুধু ভ্রমণ কাহিনীই লিখতেন না তার সাথে সেখানে বক্তৃতাও দিতেন। এরপর তিনি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের উপর তিনি বেশ কিছু মজার চিঠি লেখেন যেগুলোর নাম দেওয়া হয় 'দি ইনোসেন্ট এ্যাব্রোড'। যেগুলো প্রকাশ হয় ১৮৬৯ সালে।

এই সময় চার্লস ল্যাঙ্গডন এর সাথে মার্ক টোয়েনের পরিচয় হয়। তিনি তার বোন অলিভিয়ার ছবি টোয়েনকে দেখান। টোয়েন ছবি দেখেই অলিভিয়ার প্রেমে পড়ে যান। ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউ ইর্য়কে তাদের বিয়ে হয়। এরপর টোয়েন নিউ ইর্য়কের বাফেলো নামক জায়গায় বাস করতে থাকেন। তিনি সেখানকার এক পত্রিকা বাফেলো এক্সপ্রেস এর অংশীদারও হন। এই পত্রিকার জন্য তিনি লিখতেনও। এখানেই তার ১৯ মাস বয়সী সন্তান ল্যাঙ্গডন ডিপথেরিয়া রোগে মারা যায়। এরপর টোয়েন পরিবার কানেকটিকাট রাজ্যের হার্টফোর্ড এ চলে যান।

এরপর আবার টোয়েন ইউরোপে ভ্রমণে যান এবং একটি বই লেখেন যার নাম, ‘এ ট্রায়াম্প অ্যাব্রোড’। ১৯০০ সালে তিনি আবার আমেরিকা ফিরে আসেন। ১৯০৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টর অফ লিটারেচার উপাধি দেয়। সে বছরই তিনি তার নিজের জীবন কাহিনী লিখতে শুরু করেন।

অনেক হাসির গল্প লিখলেও টোয়েনের জীবনে একের পর এক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৮৯৬ সালে তার মেয়ে সুসি মারা যায়। ১৯০৪ সালে তার স্ত্রী অলিভিয়া তাকে রেখে পরলোকে পাড়ি জমায়। ১৯০৯ সালে তার আরেক মেয়ে জীনও মৃত্যুবরণ করে। এতগুলো বেদনা টোয়েনকে ব্যাথিত করে তোলে। তবে সারাজীবন প্রিয় মানুষদের মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখার পরও তিনি সবসময় হাসির গল্প লিখে মানুষের বেদনাকে সামান্য সময়ের জন্য হলেও দুরে সরিয়ে রাখতে পেরেছেন।

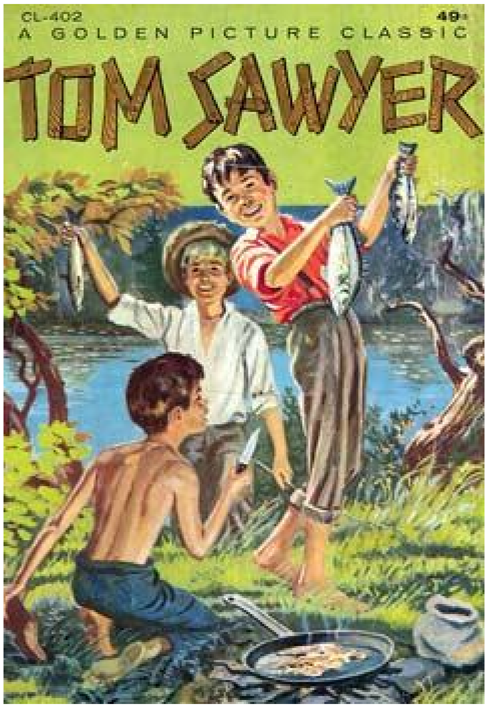

তার লেখাগুলো ছিল হাসির। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে রয়েছে অনেক গভীর আনন্দ আর ভাবনার বিষয়। বাস্তবেও তিনি ছিলেন এক মজার মানুষ। তার কর্মকাণ্ড ছিল নানা ঘটনায় ভরা।

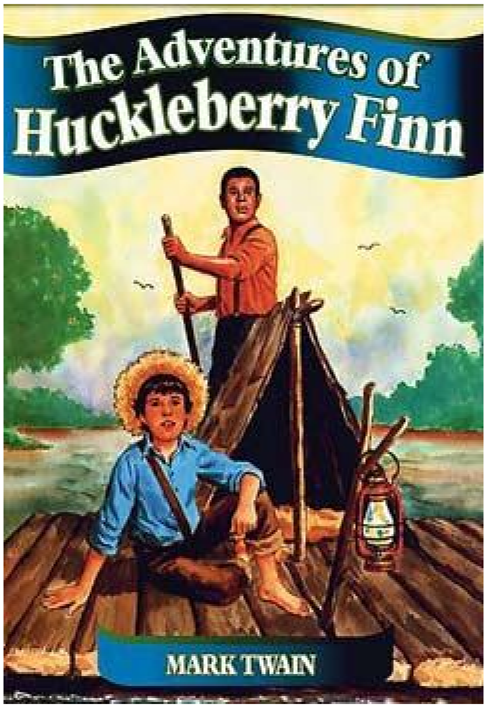

তার 'অ্যাডভেঞ্চার অফ টম সয়্যার' সব সময় সকল মানুষের প্রিয় হবে থাকবে। খুবই দুষ্টু ছেলে টম। তার মাথায় রাজ্যের দুষ্টু বুদ্ধি ঘুরে বেড়ায়। এই জন্য তার খালা তাকে কড়া শাসনে রাখেন। কিন্তু দুষ্টুদের তো আর বুদ্ধির অভাব হয় না। সে ঠিকই ফাঁকি দেয় খালাকে। কিন্তু খালার শাসনে একসময় অতিষ্ট হয়ে ওঠে টম। পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে একটা ডাকাত দল গড়ে তোলে সে। গভীর রাতে পাহাড়ের গোপন সুড়ঙ্গে হাত কেটে শপথ নেয় তাড়া। পরিকল্পনা আটে কীভাবে তারা মানুষদের ধনসম্পদ লুট করবে। কিন্তু ডাকাতি করতে গিয়েই একসময় তারা নিজেরাই পড়ে সত্যিকার একদল ডাকাতের কবলে। শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা ডাকাত দলকে ধরিয়ে দিতে সমর্থ হয়। আর সেই সাথে তার আর হাক ফিনের ভাগ্যে আসে অনেক গুপ্তধন। এলাকায় তারা হিরো হয়ে যায় এই ঘটনায়। মজার এবং রোমহর্ষক একটি বই। টমের শৈশব যেন আমাদের সকল কিশোরের শৈশব। এই গল্পের চরিত্রগুলো কিন্তু একেবারে কাল্পনিক নয়। তার স্কুল জীবনের দুই বন্ধু জন ব্রিজ এবং উইল বয়েন দুজন মিলে হয়ে যায় টম। এই গল্পে আরেকটি চরিত্র আছে যার নাম হাকেলবেরি ফিন। এই হাক হলো তার ছোট বেলার বন্ধু টম ব্লাঙ্কেনশিপের আদলে তৈরি করা এক চরিত্র।

তার আরেকটি নামকরা কাহিনী হলো ‘অ্যাডভেঞ্চার অফ হাকেলবেরি ফিন’। এই গল্পের নায়ক টম সয়ারের বন্ধু হাক ফিন। যে কিনা অনেকটাই ভবঘুরে। মাতাল বাবার অত্যাচার থেকে বাঁচতে সে একদিন পালায়। পথে তার সাথে দেখা হয় পালিয়ে যাওয়া এক নিগ্রো দাস জিমের। তারপর তারা একত্রে পালাতে থাকে। মিসিসিপি নদীতে তারা নৌকা নিয়ে পালাতে গিয়ে নানান ঘটনার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তারপর তারা পালাতে পারে না। এই বইটি একসময় আমেরিকায় নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু পাঠকদের জোর দাবির মুখে সরকার তা তুলে নিতে বাধ্য হয়। তবে হাকলবেরি ফিন এই বই আরেকটি কারনে বিখ্যাত। এর আগে সবাই জানতো স্যামুয়েল ল্যাঙ্গহর্ন ক্লিফোর্ডকে লেখার জন্য মার্ক টোয়েন নামটি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এই নামের মানে কি কেউ তা জানতো না। এই বইয়ে তিনি তার এই নাম বেছে নেবার কারণ এবং এর মানে কি তা উল্লেখ করেন।

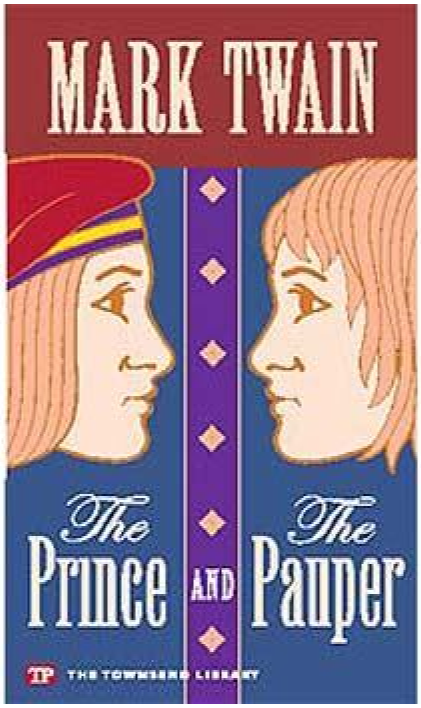

‘দি প্রিন্স এন্ড দি পপার’ তার আরেকটি জনপ্রিয় বই। এই গল্পের নায়ক কিন্তু দুজন একজন রাজার ছেলে আরেকজন রাস্তার ছেলে। কিন্তু দুজনে চেহারা এক। একদিন তাদের এক জায়গায় দেখা হয়। খেলাছলে তারা দুজন তাদের পোশাক বদল করে। এরপর রাজার ছেলেকে আর কেউ চিনতে পারে না। তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে

দেওয়া হয়। আর রাস্তার ছেলে হয়ে যায় রাজপুত্র। এরপর আসল রাজপুত্রের জীবনে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা। সে আবারও রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

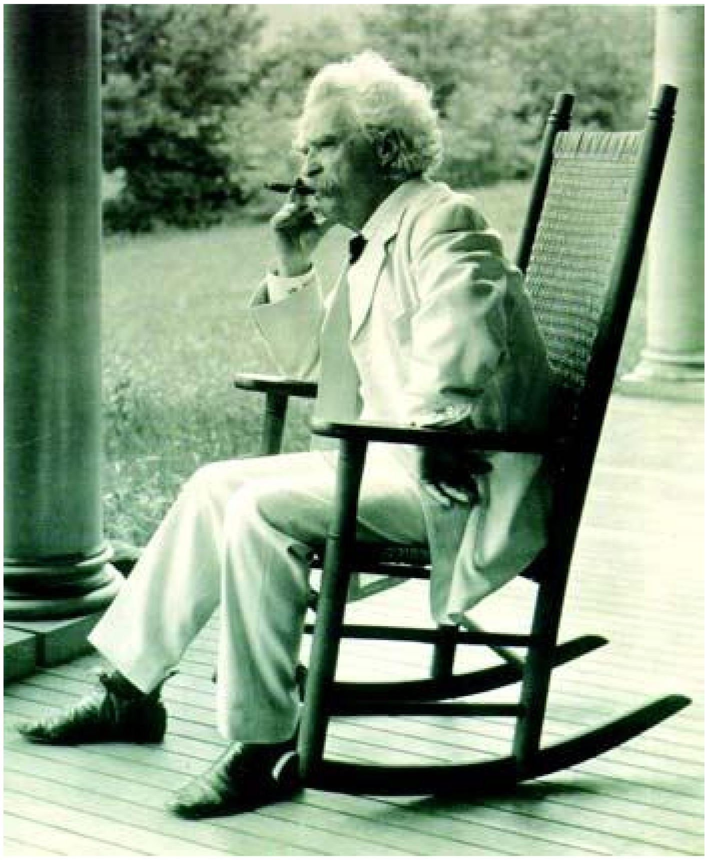

কীভাবে রাজার ছেলে আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে আসে সেই নিয়ে তৈরি হওয়া কাহিনী দি প্রিন্স এন্ড দি পপার।

মার্ক টোয়েন অনেক ছোট গল্প লিখেছেন। সবগুলোই খুব মজার। কিন্তু লেখকের বাইরে তার অন্য কিছু পরিচয় আছে। লেখক হিসেবে তিনি বেশ ভালোই টাকা আয় করেছেন। সেই টাকাগুলো কিন্তু তিনি নানা কাজে বিনিয়োগ করেছিলেন। আমেরিকার এক বিখ্যাত আবিস্কারকের নাম নিকোলাস টেসলা। টেসলা ছিল মার্ক টোয়েনের বন্ধু। তিনি অনেক সময় টেসলার ল্যাবরোটরিতে বসে আড্ডা মারতেন।

এখন এ রকম বিখ্যাত উদ্ভাবক যার বন্ধু তার মাথায়ও আবিস্কারের ভূত চাপে বইকি। টোয়েন ছোটদের জন্য এক বিশেষ বাতি আবিস্কার করেছিলেন। যাকে ছোটদের বেড ল্যাম্প বলা হয়। প্রিন্টিং এর জন্য এক বিশেষ মেশিন কোলোটাইপও তার আবিস্কার।

টোয়েন শুধু যে লেখক ছিলেন তা নয় তিনি একই সঙ্গে সচেতন নাগরিকও ছিলেন। ১৯০১ সালে পর থেকে তিনি এন্টি ইম্পেরিয়াল লীগে যোগ দেন। এবং তিনি এক সময় তার ভাইস প্রেসিডেন্টও হন। ইউরোপ ও আমেরিকা এক সময় বিশ্বের অনেক দেশ দখল করেছিল। এই দখল করাটাকে বলা হতো ইম্পেরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ। টোয়েন এই অন্য দেশ দখল করার প্রতিবাদ করতেন। এর জন্য তিনি নিজেই প্রতিবাদ লিপি তৈরি করতেন।

তবে মার্ক টোয়েন অনেক কিছু করলেও তার অর্থনৈতিক অবস্থা কখনও খুব ভালো ছিল না। অনেকে বলেন, তিনি মোটেও হিসেবি ছিলেন না। এই সমন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে।

টেলিফোন আবিস্কার করেন আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল। তিনি টেলিফোন আবিষ্কারে পর তাকে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগাতে চাইলেন। সে জন্য তিনি এক কোম্পানি খুললেন।

তিনি অনেক বিখ্যাত ব্যাক্তিকে গিয়ে বললেন, তার কোম্পানির শেয়ার কিনতে। সেই শেয়ারের দাম ছিল ১০০ ডলার। বেল সাহেব মার্ক টোয়েনের কাছে এসে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তার এই টেলিফোন কোম্পানীর একটা শেয়ার কেনে। বেল মহাশয় আরো আশ্বাস দিলেন, যে যারা এই শেয়ার কিনবে তারা কিছুদিনের মধ্যেই বড়লোক হয়ে যাবে। বেলের কথায় টোয়েন মোটেও আগ্রহী হলেন না। তিনি বেলকে ১০০ ডলার না দিয়ে তার এক বন্ধুকে এই ডলার ধার দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে বেল-এর কোম্পানির শেয়ারের দাম হয়ে গেল কোটি টাকা। আর মার্ক টোয়েনের বন্ধুটি দেউলিয়া হয়ে গেল।

আরেকবার মার্ক টোয়েন ঠিক করলেন তিনি নারকেলের ব্যবসা করবেন। আর এর জন্য তিনি একটা ক্যারিবিয়ান জাহাজে চড়ে বসলেন। কিন্তু জাহাজ যখন মাঝপথে তখনই তার টাকা ফুরিয়ে আসার উপক্রম হলো। ফলে নারকেল ব্যবসা বন্ধ রেখে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। যদি তিনি প্রকাশনা শিল্পে নাম লিখিয়েছিলেন কিন্তু ব্যবসা অসফল হওয়া নিজেকে প্রায় দেউলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় স্ট্যার্ন্ডাড অয়েলের মালিক হেনরি রর্জাসের সাথে তার পরিচয় ঘটে। রজার্স তাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন। মার্ক টোয়েন ছিলেন ভীষণ বন্ধুবৎসল মানুষ। তার সময়ের অনেক বিখ্যাত ব্যাক্তির সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব ছিল যাদের মধ্যে অন্যতম হেলেন কেলার।

আজও মার্ক টোয়েন সারাবিশ্বে জনপ্রিয়। আমেরিকায় রয়েছে মার্ক টোয়েন ইন্টারমিডিয়েট স্কুল। এছাড়া আরো বেশ কয়েকটি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় তার নাম বহন করছে। এ ছাড়া আমেরিকার সান এ্যান্টোনিওর স্ক্রুজ্‌ট এ স্যামুয়েল ক্লিমেন্স নামেও স্কুল রয়েছে। এ ছাড়া মার্ক টোয়েন মেমোরিয়াল ব্রিজ নামের এক সেতুও রয়েছে সেখানে। মার্ক টোয়েনের নামে এক পুরস্কারও চালু হয়েছে সেখানে। যার নাম 'মার্ক টোয়েন প্রাইজ ফর আমেরিকান হিউমার'। মানে মজার লেখার জন্য লেখকেরা পাবে মার্ক টোয়েন পুস্কার। শিশুদের সেরা লেখককেও মার্ক টোয়েন পুরস্কারে ভুষিত করা হয়।

অভিনেতা হাল হলব্রুক একাই একটা অনুষ্ঠান করেন আমেরিকান টিভি চ্যানেল সিবিএস-এ। এর নাম মার্ক টোয়েন টুনাইট বা আজ রাতের মার্ক টোয়েন। এই অনুষ্ঠানটি গত পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে।

মার্ক টোয়েনের লেখা কতটা জনপ্রিয় তার সমন্ধে একটা গল্প চালু আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে আমেরিকার শত্রুতা চলছিল। এক সময় সোভিয়েটে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিল নিকিতা ক্রুশ্চেভ। একবার নিকিতা ক্রুশ্চেভকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কি কখনও আমেরিকায় পারমানবিক বোমা মারার কথা ভাবেন। ক্রুশ্চেভ জবাব দিয়েছিল, “পাগল হয়েছেন। ওখানে টম সয়্যার আছেন না।”

মার্ক টোয়েনের জন্ম হয়েছিল যে বছর সে বছর আকাশে হ্যালির ধুমকেতু দেখা হয়। আমরা জানি প্রায় প্রতি ৭৫ বছর পর পর এই ধমকেতু আবার পৃথিবীর আকাশে ফিরে আসে। মার্ক টোয়েন প্রায়শই বলতেন তিনি হ্যালির ধুমকেতুর সাথে পৃথিবীতে এসেছেন তার সাথেই আবার পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন। মার্ক টোয়েনের নিজের মৃত্যু সমন্ধে এই ভবিষ্যতবাণীও সফল হয়েছিল। ১৯১০ সালে আবার পৃথিবীর আকাশে হ্যালির ধুমকেতু ফিরে আসে। সে বছর কানেকটিকাটের রিডিং শহরে হৃদরোগে মার্ক টোয়েন মারা যান। তার মানে হ্যালির ধুমকেতু তার সাথে আসা পৃথিবীর সন্তানটিকে তার সাথে করেই নিয়ে যায় কেবল রেখে যায় তার লেখা অমর কীর্তিগুলো।